শাপলা চত্বরে

গৌরব

বই	**শাপলা চত্বরে গৌরঙ্গ**
লেখক	আলী আবদুল্লাহ
বানান সমন্বয়	মাকামে মাহমুদ ও অন্যান্য
নিরীক্ষণ	মুফতি মহিউদ্দীন কাসেমী
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

শাপলা চত্বরে
গোরুদ্ধ

আলী আবদুল্লাহ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

শাপলা চত্বরে গৌরঙ্গ

প্রকাশকাল : বইশেলা ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার, আন্ডার গ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮,
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com
ইসলামী টাওয়ার, আন্ডার গ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮,
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১
এবং **রকমারি** ও **ওয়াফি লাইফ**-এ

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ১৭৬, US $ 6, UK £ 4

SHAPLA CHOTTORE GOURONGO

Witer : Ali Abdullah

Published by
Muhammad Publication
Islami Tower, Under Ground, Shop # 18
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-6599-3

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

আমার বাবা। যিনি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের অসুস্থতার সময় দৌড়ে যেতেন। হাসপাতালে নেওয়া। কেবিন ম্যানেজ করা। ডাক্তারের সাথে কথা বলে সবকিছু বুঝে নেওয়ার কাজটা তিনি খুব যত্নসহকারে করতেন। এই কারণে আত্মীয়দের মধ্য থেকে যারাই গুরুতর অসুস্থ হতো, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা বাবার শরণাপন্ন হতো। যে মানুষটা অন্য মানুষের অসুস্থতার সময় বটগাছের মতো ছায়া দিয়ে পাশে থেকেছেন। যিনি আল্লাহ ইচ্ছায় মানুষের সুস্থতার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সেই মানুষটা আজকে ভীষণ অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। হাঁটতে পারেন না। কথা বলতে পারেন না ঠিকমতো। একসময়ের কঠোর পরিশ্রমী সুঠামদেহী একজন মানুষ আজকে অসহায়ের মতো চুপচাপ শুয়ে থাকেন।

আর আমার মা। এক কালে স্বামীর হাত ধরে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো এই রমণী আজ হাসিমুখে স্বামীর সেবা-শ্মশ্রূষা করে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখলে মনে হয় জান্নাত কিনে নিতে ব্যস্ত স্বামীর সেবা করে হয়ে আছেন তিনি।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা-মায়ের নামের লিস্ট করা হলে, সেই লিস্টে আমার বাবা এবং মায়ের নামটি থাকবে এটা নিশ্চিত, ইনশাআল্লাহ।

আমি উৎসর্গ কিংবা অর্পণ ব্যাপারটা ঠিক বুঝি না। তবে বইটি থেকে আল্লাহ যদি আমাদেরকে সাওয়াব দেন। সেটা যেন আমার বাবা-মায়ের আমলনামায় লেখা হয়ে যায়, এই দোয়া করছি। এবং এর সাথে আল্লহ যেন

আমাদেরকেও ক্ষমা করে দেন। জান্নাতে আমাদের সকলকে একত্রিত করেন। আমিন ।

‘রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা’

‘হে আমার প্রতিপালক, আমার পিতামাতার প্রতি দয়া করুন, যেমন দয়া, মায়াসহকারে তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।’

—লেখক

প্রকাশকের কথা

সারা বছরই আমরা বই প্রকাশ করি। কিন্তু একুশে বইমেলাকে নিয়ে থাকে আমাদের ভিন্ন আয়োজন। শুধু আমাদেরই নয়; বরং সকল প্রকাশনী ভিন্ন কিছুর আয়োজনে ব্যস্ত থাকে জাতীয় এই বইমেলাকে কেন্দ্র করে।

'শাপলা চত্বরে গৌরঙ্গ' শিরোনামের গল্পটিও আমাদের নিয়ে যাবে সেই ভিন্নতার দিকে। আর এ বিশেষত্বের কারণেই গল্পের শিরোনামেই করা হয়েছে বইয়ের নামকরণ।

তাহলে চলুন প্রথিতযশা গল্পকার আলী আব্দুল্লাহ'র কলমে জেনে নিই সেই ভিন্ন কিছুকে। আশা করি 'সুবোধ' ও 'কারাগারে সুবোধ'-এর মতো এবারও তিনি আমাদেরকে মোহিত করবেন।

এ গল্প শুধু গল্প নয়; এতে রয়েছে ঈমান ও আমলি খোরাক। সেই খোরাক থেকে আমাদের ঈমান ও আমলকে আল্লাহ সতেজ করুন। তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। একইভাবে বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই জাযায়ে খাইর দান করুন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি রব্বুল আলামিন। দুরুদ ও সালাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ, বংশধর, সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ও সালেহিনগণের প্রতি।

'শাপলা চত্বরে গৌরঙ্গ' গল্পটিতে গৌরঙ্গ নামের একটি হিন্দু ছেলেকে ২০১৩ সালের ৫ই মে'র শাপলা চত্বরে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হাজারো নবিপ্রেমী তাওহিদি জনতার সাথে এরকম একটা ভয়াবহ পরিবেশে অবস্থান করে, গৌরঙ্গ কী করে সেটাই আমাদের দেখার ইচ্ছা ছিল। আল্লাহ আমাদের সেই ইচ্ছেকে পূরণ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

এ ছাড়াও বেশ কিছু ছোট গল্প আছে বইটিতে। গল্পগুলো লিখতে বসে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। কিছু গল্প হাসিয়েছে। কিছু গল্প চোখের পানি ঝরিয়েছে। তবুও লিখে বেশ আনন্দ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আশা করছি, আমাদের রব সেই আনন্দ পৌঁছে দেবেন পাঠকদের অন্তরেও। এবং আমাদের মতো গুনাহগারের এই কাজকে কবুল করে নেবেন।

আর একবার যদি আল্লাহ তাআলা এই বইটিকে মানুষের হিদায়াতের মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন এবং এই বইয়ের লেখক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁর করুণা এবং ক্ষমা দান করেন, তাহলেই আমরা সফল, ইনশাআল্লাহ।

এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যে রইল শুভকামনা।

——আলী আবদুল্লাহ

পশ্চিম আগারগাঁও , ঢাকা
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইংরেজি
১৯ জামাউল সানি ১৪৪২ হিজরি

সূচিপত্র

কীভাবে আঁকি তোমায়... ১১
সত্যি কারের মনস্টার ১৪
নেশা ২৪
ভোর ২৭
গুনাহ ৩০
সুসংবাদ ৩৯
একজন অপরিচিত সেলিব্রিটি : ওয়াইজ আল করনি ৪৩
একজন নুয়াইমান এবং একটি উপলব্ধি ৪৯
লাভিনা একজন আমেরিকান আর্মি ৫২
কল্পনায় গল্পনায় ৫৪
দশ সেন্ট এর জন্যে ৫৯
মদখোর থেকে মুহাদ্দিস ৬১
সত্যের পথে অবিচল ৬৩
শাপলা চত্বরে গৌরঙ্গ ৬৯
কুরআন, করোনা এবং আমি ১১৯

কীভাবে আঁকি তোমায়...

ক্লাসের ছোট ছেলে-মেয়েদের হাতে একটি করে সাদা কাগজ দেওয়া হয়েছে। সবাই কাগজ পেয়েছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ইসাবেলা পুরো ক্লাসরুম একবার ঘুরে দেখল। তারপর ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলল—

> আশা করছি তোমরা সবাই গতকাল 'প্লাস দো লা রেপুবলিক চত্বরের' জঙ্গিবাদ বিরোধী সংহতি সমাবেশে যোগ দিয়েছিলে। আজকের ক্লাসে তাই তোমাদেরকে একটা নতুন অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি। আজকে তোমাদের প্রফেট মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আঁকতে হবে।
>
> মনে করো, শার্লি হেবদোর আগামী সংখ্যার প্রথম পাতায় তোমাদের আঁকা প্রফেট মুহাম্মদের এই ছবিটা ছাপা হবে, ঠিক আছে?!

ইসাবেলা এই বলে ঘড়ির দিকে তাকাল। ছেলে-মেয়েরা যার যার মতো আঁকতে শুরু করেছে। শুধু শেষ বেঞ্চের কোণায় বসে থাকা ছেলেটা অপ্রস্তুতভাবে ইতিউতি করছে।

ইসাবেলা আড়চোখে ছেলেটিকে একবার দেখল। তার এমন অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়ার কারণটা ইসাবেলা খুব ভালো করে জানেন। ছেলেটার নাম আবদুল্লাহ। একজন মুসলিম। প্রফেট মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধর্মের অনুসারী।

আবদুল্লাহ বড় বড় চোখ করে ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা বলতে চায় সে।

ইসাবেলা প্রথমে দেখেও না দেখার ভান করল। কিন্তু একটু পর আবদুল্লাহ হাত তুলল।

নাহ, আজকে জঙ্গিবাদের পক্ষে কথা বলার সুযোগ কাউকেই দেওয়া হবে না। ইসাবেলা আবদুল্লাহকে হাত নামিয়ে নেওয়ার ইশারা দিলেন এবং ছবি আঁকা শুরু করতে বললেন।

আবদুল্লাহ বিমর্ষ মুখে মাথা নিচু করে রইল। এভাবে কেটে গেল অনেকটা সময়। এরপর চারপাশে একবার চোখ বুলাল সে, তারপর দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে তার পেন্সিলের নিবটা ছোঁয়াল কাগজে।

ম্যাডাম ইসাবেলা এতক্ষণ গম্ভীর মুখে লক্ষ করছিলেন আবদুল্লাহকে। এখন তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

প্রফেট মুহাম্মদকে নিয়ে তোমাদের গোঁড়ামি আজ মাটির সাথে পিষে দেবো, ভাবলেন ইসাবেলা। আর ঠিক তখনই ইসাবেলার অজান্তেই তার ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠল বিদ্রূপের তীর্যক হাসি।

২.

ক্লাস শেষ হয়েছে অনেক আগে। জমা হওয়া অ্যাসাইনমেন্টগুলো সামনে নিয়ে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে ইসাবেলা।

আবদুল্লাহ কী এঁকেছে সেটা দেখার কৌতূহল ধরে রাখা কঠিন। তবে ইসাবেলা ঠিক করে রেখেছে, আবদুল্লাহ যেমনই আঁকুক না কেন হাইস্ট মার্কটা তাকেই দেওয়া হবে এবং ক্লাসে সবার সামনে তার এই ছবির জন্যে তাকেই পুরস্কৃত করা হবে।

কফির কাপটা সরিয়ে রেখে স্তূপ হয়ে থাকা অ্যাসাইনমেন্টগুলোর মধ্য থেকে ইসাবেলা আবদুল্লাহর কাগজটা বের করল। আবদুল্লাহর জমা দেওয়া কাগজটায় চোখ পড়তেই ইসাবেলার ভ্রূ কুচকে গেল।

তার কাগজে কোনো ছবি নেই। আছে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা একটা চিঠি।

ইসাবেলা গম্ভীর মুখে পড়তে শুরু করল—

প্রিয় প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

আজ আমাদের ক্লাস টিচার আপনার ছবি আঁকতে বলেছিল। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে আপনাকে আঁকতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আঁকতে পারিনি। আমি তো আপনাকে কখনোই দেখিনি, কীভাবে আঁকব? তাই আমি আমার চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

জানেন ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তখন আমি কী দেখলাম?! আমি আমার মাকে আপনার জীবনী পড়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে দেখলাম। বাবাকে দেখলাম সারা রাত আল্লাহর ইবাদাত করতে। আমার বড় বোনটাকে দেখলাম রাস্তাঘাটে শত অপমানিত হওয়ার পরও হাসিমুখে নিকাব পরতে। আমার মুসলিম বন্ধুদেরকে দেখলাম আমাকে বুকে জড়িয়ে ক্ষমা চাইতে, যদিও দোষটা হয়তো আমারই ছিল। আমি আজকে এই ছবিগুলোই আঁকতে চেয়েছিলাম।

এই অঞ্চলের মানুষগুলো বড়ই অদ্ভুত! এরা সবকিছুই দেখতে চায়, সবকিছুই এদের চোখের সামনে রাখতে চায়।

তাই আমি আমার চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম, আর আমি দেখেছিলাম আপনি মুচকি হেসে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমাদের সবার দিকে এগিয়ে আসছেন। ইয়া রাসুলাল্লাহ! পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর, সব থেকে নিখুঁত আপনার সেই হাসি। আমি কী করে এত নিখুঁত এত সুন্দর হাসিটাকে কাগজে আঁকব?

আমি আমার টিচারকে এগুলো সবই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে ক্লাসে কোনো কথা বলতে দেননি।

অবশ্য এখানে হয়তো তার কোনো দোষ নেই। মেম হয়তো কখনো কাউকে না দেখে ভালোবাসতেই শেখেননি।

কাউকে না দেখেও যে ভালোবাসা যায় সেটা হয়তো এরা কখনো বুঝবেই না। কিন্তু আমি, আমি আপনাকে ভালোবাসি। অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি। কখনো না দেখেই ভালোবাসি।

আমি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারি না। কিন্তু আমি লিখতে পারি। আর তাই আমি আপনার কাছে এই চিঠিটা লিখলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি আপনি আমাদের মাঝে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক সেকেন্ড অথবা এক মুহূর্তের জন্যেও ফিরে আসতেন, তাহলে তারা ঠিকই বুঝতে পারত, আপনাকে আমরা কেন এতটা ভালোবাসি।

ইসাবেলা আবদুল্লাহর লেখা চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে আছেন। আর কারও অ্যাসাইনমেন্ট চেক করতে ইচ্ছা করছে না। সরিয়ে রাখা কফিটাও ঠান্ডা হচ্ছে। হোক, ইসাবেলার কিছুই যায় আসে না।

[বি. দ্র. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে তৈরি করা একটা শর্ট ফিল্ম চোখে পড়েছিল। যতবার দেখেছি ততবার চোখ ভিজে এসেছে। সেই শর্ট ফিল্মটার বিষয় বস্তু নিয়েই এই গল্পটা লিখলাম। জানি হয়তো পুরোই ছাইপাঁশ হয়েছে! তাতে কী... চোখ ভেজানো কিছু ছাইপাঁশ না হয় কাগজে তোলা থাকল।]

—আবদুল্লাহ
১২ জানুয়ারি, প্যারিস

সত্যি কারের মনস্টার

রুস্তম মমতা মাখা চোখে তার নয় বছরের মেয়ে ফারিজাকে দেখছেন। দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। দেড় বছর আগে, ছোট ছেলে ফাইয়াজের জন্মের সময় ফারিজার মা মারা গেল। তখনও এতটুকু ছিল ফারিজা। স্ত্রীর মৃত্যুশোকে রুস্তম যখন কাঁদছিল, ফারিজা তখন বাবার চোখ মুছে দিয়ে বলেছিল, কান্না করছ কেন বাবা? আম্মু তো আছেই। আকাশের ওপরে আছে। সেখানে গড আম্মুকে দেখে রাখবেন। তুমি চিন্তা করো না।

মাকে হারানোর পর ছোট্ট ফারিজা এই দেড় বছরে অনেকটুকু বড় হয়ে গেছে। ছোট ভাই ফাইয়াজকে খাওয়ানো, কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, আদর করা, তার দিকে খেয়াল রাখা—এসব ফারিজাই করে। মেয়েটা এতটুকু বয়সে এগুলো কীভাবে করছে তা-ই ভেবে বিস্মিত হয় রুস্তম। দেশের এই যুদ্ধাবস্থায় নানা রকম দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটাতে হয়। মেয়েটাকে সময় দেওয়া হয়ে ওঠে না। একটু আদরও করা হয় না। অবসর সময় পেলে সারাক্ষণই ছোট ছেলে ফাইয়াজকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে হয়। মা-মরা মেয়েটারও তো কিছু আদর পাওনা।

রুস্তম আদর জড়ানো কণ্ঠে মেয়েকে ডাকে—

মা ফারিজা?

জি, বাবা।

ফারিজা ঝুঁটি দুটো দোলাতে দোলাতে বাবার সামনে এসে দাঁড়ায়। রুস্তম বলে,

একটা কবিতা শোনাও তো মা।

কী কবিতা শোনাব, বাবা?

যেকোনো একটা কবিতা শোনাও, তোমার ইচ্ছামতো।

ফারিজা তার কোমল হাত দিয়ে চোখের সামনে চলে আসা কোকড়া চুলগুলো সরিয়ে নেয় আলতো করে। তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বলে,

বাবা, কবিতা তো মনে পড়ছে না। কী করি বলো তো?

হুম। তাহলে একটা গল্প শুনিয়ে দাও।

গল্প? আচ্ছা মনে করি একটু দাঁড়াও।

ফারিজা আনমনা হয়ে গল্প মনে করার চেষ্টা করে। কিন্তু সাথে সাথেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,

গল্প না বাবা, একটা ছোট্ট ছড়া মনে পড়েছে। ইংরেজি ছড়া। ওটা বলি?

ঠিক আছে বলো।

ফারিজা গলা পরিষ্কার করে মিষ্টি করে বলতে লাগল—

The world is so full

Of a number of things,

I'm sure we should all

Be as happy as kings.

বাহ! অসাধারণ হয়েছে তো। এই ছড়া তুমি কীভাবে শিখলে?

ইন্টারনেট ঘেঁটে শিখেছি।

ইন্টারনেট ঘেঁটে আর কী কী শিখেছ?

অনেক কিছু শিখেছি বাবা। কবিতা শিখেছি, গান শিখেছি, ধাঁধা শিখেছি।

রুস্তম চোখ বড় বড় করে অবাক হবার ভঙ্গিতে বলে,

তাই নাকি?

ফারিজা হাসি মুখে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

ফারিজার চোখ চক চক করছে। বাবাকে মুগ্ধ হতে দেখে তার আনন্দ হচ্ছে।

ছড়াটা তোমার ভালো লেগেছে বাবা?

অ-নে-ক ভালো লেগেছেরে মা।

থ্যাংক ইউ, বাবা।

রুস্তম মুচকি হাসে। ফারিজার আনন্দ আরও বেড়ে যায়। সে জিজ্ঞেস করে,

বলো তো বাবা, এটা কার লেখা?

আই গেস এটা তুমি নিজেই লিখেছ?

ফারিজা বাবার কথা শুনে খিল খিল করে হেসে কুটি কুটি হচ্ছে। তার হাসি দেখে মনে হচ্ছে এমন উদ্ভট কথা সে এর আগে কখনো শোনেনি।

রুস্তম অবাক দৃষ্টিতে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে, কী সুন্দর হাসি! এই একটা হাসির জন্য সে পুরো পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করতে পারে। রুস্তম শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল,

তুমি লেখনি?

ফারিজা আবার এক গাল হেসে বলল, না বাবা। আমি কেন লিখতে যাব। বললাম না, ইন্টারনেট ঘেঁটে পেয়েছি! এটা লিখেছেন রবার্ট লুইস স্টিভেনসন। ওনাকে চেনো বাবা?

না মা, চিনি না। কবি, সাহিত্যিক তেমন কাউকেই আমি চিনি না।

হুম। তোমার চেনার দরকারও নেই বাবা। তুমি তো সারা দিন বিমান নিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াও, দেশকে পচা মানুষগুলোর হাত থেকে রক্ষা করো। তুমি আমার সুপার হিরো বাবা।

রুস্তম মিহি করে হাসল।

ফারিজা বলল, বাবা জানো, উনি একজন স্কটিশ কবি। অনেকদিন আগে বাচ্চাদের জন্য তিনি এই ছড়াটি লিখেছিলেন। আমার খুব প্রিয় একটি ছড়া।

ও আচ্ছা।

রুস্তমের চোখে পানি এলো। তার মেয়ে শুধু যে মায়াবতী হয়েছে তা নয়। সে বুদ্ধিমতীও হয়েছে। এইটুকুন বয়সে সে কেমন করে বড়দের মতো কথা বলছে। যে ঘরে মা থাকে না সে ঘরের মেয়েরা নাকি দ্রুত বড় হয়ে যায়। ফারিজার ক্ষেত্রেও কি তাই ঘটছে?

বাবা একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

বলো মা, কী কথা?

তুমি প্লেন নিয়ে উড়ে উড়ে সুপার হিরোর মতো যাদেরকে মারো। ওই যে বড় বড় চুল-দাড়িওয়ালা লোকগুলো। ওরা কি মানুষ? নাকি ওরা মনস্টার?

তোমার কী মনে হয়?

আমার মনে হয় ওরা মনস্টার।

হ্যাঁ, মা ওরা পচা। মনস্টারের মতোই পচা।

আচ্ছা বাবা, মনস্টার যেমন মানুষের রক্ত খায় ওরাও কি তা-ই খায়? ওরা কি আমাদের সামনে পেলে আমাদের রক্ত খেয়ে ফেলবে?

রুস্তম এইবার হাসি আটকে রাখতে পারল না। এক গাল হেসে বলল,

কেন রে মা? তুমি ভয় পাচ্ছ? ভয় পেয়ো না। ওরা কিছুই করতে পারবে না। আমি ওদেরকে মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছি।

ফারিজা খুশিতে হাতে তালি দেয়।

ভালো করছ বাবা। মেরে ওদেরকে একদম তক্তা বানিয়ে দেবে।

ফারিজা হাসছে। প্রাণ খুলে হাসছে। মেরে তক্তা বানানোর ব্যাপারটায় সে খুব মজা পেয়েছে। সে বাবাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন শোবার ঘর থেকে ফাইয়াজের কান্নার শব্দ ভেসে এলো। ফারিজা জিভে কামড় দিয়ে বলল,

ইস! ফাইয়াজকে ফিডারে দুধ দিয়ে আসতে ভুলে গেছি। আমি এখন যাই বাবা। ফাইয়াজকে খাওয়ানোর পর আমি একটু ট্যাব দেখব।

ট্যাবে কী দেখবে?

ইউটিউবে স্টার ওয়ার্স এর ফ্যান ফিকশন কার্টুন আছে। তা-ই দেখব।

রুস্তম হাসিমুখে অনুমতিসূচক মাথা নাড়ল। বাবার অনুমতি পেয়ে এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেল ফারিজা। রুস্তম তার শরীর চেয়ারে এলিয়ে দিলো। সে খুবই পরিশ্রান্ত। তার বিশ্রামের দরকার। তবে মেয়েটার সাথে কথা বলে অনেকটাই ভালো লাগছে। সতেজ লাগছে। গত দুদিন বেশ ধকল গেছে। পুরো মিশনে রুস্তমই ছিল সবথেকে বেশি তৎপর। আজকে আর আগামীকাল তাই তাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

এই বিশ্রামের সময়গুলোতে রুস্তমের সবথেকে বেশি যে ব্যাপারটা খারাপ লাগে তা হলো তার হাতে কোনো কাজ থাকে না। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় বসে পার করে দেয়। ইচ্ছা করলে অফিসের কলিগদের সাথে কথা বলা যায়। অফিসে গিয়ে ঘুরে আসা যায়, কিন্তু রুস্তম তা করে না। ছুটির দিন সে অফিসের সাথে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখে। ঘরের সময়গুলোকে সে ঘরেই ব্যয় করতে পছন্দ করে। এখন অবশ্য বেশ একা লাগছে, একটা টেলিভিশন থাকলেও দেখা যেত। রুস্তমের ঘরে টেলিভিশন নেই।

এই যুদ্ধাবস্থায় তাদের অনেক কিছু করা নিষেধ। যেমন টেলিভিশন দেখা নিষেধ, ইন্টারনেটে ইউটিউব ব্রাউজ করা নিষেধ। অনেক সাইট সরকার বন্ধ করে রেখেছে। তাদের ভালোর জন্যই করা হয়েছে। রুস্তম সরকারের নেওয়া প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তকে সম্মান করে। এবং যে বিধি-নিষেধ তাদের ওপর আরোপ করা হয়েছে, সেটাকে খুবই যৌক্তিক বলে মনে করে।

সে তার দেশের প্রতি, দেশের প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুগত। এবং সে প্রেসিডেন্টের কথা মেনে চলাকে তার ধর্মের অংশ মনে করে। তাদের দেশপ্রধানের প্রতি তার ভক্তি সীমাহীন। কিন্তু এরপরও রুস্তম একটা ছোট্ট অন্যায় করে ফেলেছে। সে একটা ছোট্ট নিয়ম ভঙ্গ করেছে। আর এটা সে করেছে ফারিজার জন্যে। ইউটিউব নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কায়দা করে সে ফারিজার ট্যাবে ইউটিউব দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যদিও এটা অন্যায়। কিন্তু মেয়েটার ইউটিউব দারুণ পছন্দ। বাবা তার মেয়ের জন্য এই ছোট্ট অন্যায়টুকু করেছে। এবং অন্যায়টি করে তার বেশ ভালো লাগছে।

রুস্তমের অফিসের বিশেষ মোবাইলটি বেজে উঠল। ছুটির দিন রুস্তম ঘরের ল্যান্ড ফোনের লাইন খুলে রাখে। নিজের ব্যক্তিগত মোবাইলটা বন্ধ রাখে। যাতে কেউ তাকে বিরক্ত করতে না পারে। কিন্তু এখন যে মোবাইলটি অনবরত বেজে চলেছে, এই মোবাইলটি বন্ধ করে রাখার ক্ষমতা রুস্তমের নেই। এটা বিশেষ মোবাইল। এই মোবাইলটিতে শুধু দু-একজন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া কেউ ফোন করে না। এবং তারাও ফোন দেয় বিশেষ বিশেষ কারণে। ছুটির দিনে এই ফোনের ঘণ্টা বাজা একটা আতঙ্কের ব্যাপার। যেকোনো সময় বলা হতে পারে ছুটি শেষ, বিমানবন্দরে চলে এসো। রুস্তম আলতো করে মোবাইলটি কানে ধরল।

হ্যালো...

হাই রুস্তম, কেমন আছ?

জেনারেল ফাহাদ জাসিম ফোন দিয়েছেন। নিশ্চয় বিশেষ জরুরি কোনো বিষয়। হয়তো এখনই তাকে অফিসে যেতে হতে পারে। রুস্তম সোজা হয়ে বসল। শান্ত গলায় বলল,

জি স্যার। ভালো আছি।

ছুটি কেমন কাটছে তোমার?

জি, স্যার। ভালো।

গুড। শোন রুস্তম, তোমার জন্যে একটা বেশ গুড নিউজ আছে। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তোমার সাথে কথা বলতে চায়।

প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ স্বয়ং তার সাথে কথা বলবে। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। রুস্তম চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। যদিও ফোনের ওপাশ থেকে প্রেসিডেন্ট তাকে দেখছেন না। তারপরও এরকম মানুষের সাথে আয়েশ করে বসে কথা বলা যায় না। রুস্তম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্টের কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে। ফোনের ওপাশ থেকে মিহি একটা গলা ভেসে এলো।

হাউ আর ইউ রুস্তম?

ফাইন স্যার। হাউ আর ইউ?

আই এম গুড। লিসেন লাস্ট দিন গ্বৌতায় তুমি যে পারফরমেন্স দেখিয়েছ এর জন্যে উই আর প্রাউড অফ ইউ। তোমার জন্য বিশেষ কিছু পুরস্কার আছে। টক টু ইউর সিনিয়র, সে তোমাকে ডিটেইল জানিয়ে দেবে।

ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ, স্যার।

বেস্ট অফ লাক।

গত দুদিন রুস্তম গ্বৌতায় এয়ার রেইড দিয়েছে এবং বরাবরের মতোই সে তার মিশন সবথেকে সফলভাবে এবং কম সময়ে সম্পন্ন করেছে। গ্বৌতায় কেমিকেল ওয়েপন ব্যবহার করে ম্যাস ডিস্ট্রাকশন চালানো হয়েছে। আশা করা যায় আলেপ্পোর মতো গ্বৌতাও খুব তাড়াতাড়ি তাদের কুক্ষিগত হবে, প্রেসিডেন্ট জেনারেল ফাহাদ জেসিমকে দিলেন। তিনি বললেন,

রুস্তম শোনো। প্রেসিডেন্ট তোমার ওপর খুব খুশি। এজন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে তোমার সঙ্গে কথা বললেন। তুমি তো জানো তিনি কারও সঙ্গে এভাবে কখনো কথা বলেন না।

জি, স্যার আমি জানি।

শোনো একটা বিগ এমাউন্ট অফ মানি তোমাকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে। তবে এমাউন্টটা এখন বলব না। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারো। ছুটি কাটিয়ে অফিসে এসো তখন বলব।

জেনারেল কথাটা বলে বেশ উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন। মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার রসিকতা করে সে আত্মতৃপ্তি পেয়েছে।

রুস্তম বলল, ইয়েস স্যার। এসেই শুনব।

জেনারেল ফাহাদ হাসিমাখা মুখে বলল, আরও একটা সুসংবাদ আছে। তোমার জন্য একটা ছুটির ব্যবস্থা করেছি আমি। আগামী মাসে তুমি তোমার ছেলে-মেয়ে নিয়ে দেশের বাইরে ঘুরে আসতে পারবে। তোমার ওপর থেকে দেশ ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিচ্ছি আগামী মাসে। এটা আমার পক্ষ থেকে উপহার।

রুস্তমের মনটা ভালো হয়ে গেছে। মেয়েটাকে নিয়ে সে সুইজারল্যান্ড দেখতে যাবে। যুদ্ধ বিদ্রোহে এই মা-মরা মেয়েটাকে কোথাও সে ঘুরতে নিয়ে যেতে পারেনি, কোনো আনন্দ দিতে পারেনি। রুস্তম শক্ত মানুষ। সহজে তার চোখে পানি আসে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে চোখ ভিজে যাবে। সে তার জেনারেলের প্রতি দারুণ কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে। রুস্তম আবেগমাখা কণ্ঠে বলল,

থ্যাংক ইউ স্যার।

ইউ আর ওয়ান অফ আওয়ার বেস্ট হ্যান্ড। আমরা তোমাকে আরও অনেক দিন সার্ভিসে চাই রুস্তম। ঠিক আছে রাখছি। টেইক গুড কেয়ার অফ ইউর সেলফ।

ইয়েস স্যার।

জেনারেল ফাহদ ফোন কেটে দিয়েছেন।

রুস্তমের আনন্দ হচ্ছে। তার রীতিমতো উচ্ছ্বাস করতে ইচ্ছা করছে। সম্ভব হলে সে এখন একটা লাফ দিত। বয়স হয়েছে, এ বয়সে বাচ্চাদের মতো লম্ফঝম্ফ মানায় না। আনন্দ এমন একটা বিষয় যা একা উপভোগ করা যায় না। আনন্দ উপভোগ করতে হয় সবাইকে নিয়ে। তাহলে আনন্দ বাড়ে। আর রুস্তমের সবাই বলতে তার মেয়ে ফারিজা আর তার দেড় বছরের ছেলে ফাইয়াজ। ফারিজা নিশ্চয় তার ঘরে বসে ইউটিউব দেখছে। রুস্তম ধীর পায়ে ফারিজার ঘরে প্রবেশ করে। ফাইয়াজ বিছানায় শুয়ে দু-আঙুল মুখে দিয়ে খেলছে। তার পাশে উবু হয়ে শুয়ে ট্যাব দেখছে ফারিজা। রুস্তম মায়ামাখা গলায় ডাকে—

ফা-রি-জা।

ফারিজা ঘুরে বাবাকে দেখে। মুখ তার মলিন। চোখে পানি।

রুস্তমের বুকটা ধক করে ওঠে। মেয়ের মলিন মুখ তার মোটেও ভালো লাগে না। একটু আগেও মেয়েটা হাসিমুখে কথা বলেছে। এখনই মুখ এত মলিন করে বসে আছে কেন। রুস্তম জিজ্ঞেস করে—

কী হয়েছেরে মা? তুমি কি কান্না করছিলে?

ফারিজা কথার জবাব না দিয়ে উঠে বসল। তারপর শান্ত গলায় বলল,

বাবা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?

করো, মা।

বাবা, তুমি তো প্লেইন নিয়ে উড়ে উড়ে সব খারাপ মানুষগুলোকে আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে মনস্টারগুলোকে মেরে ফেলছ, যাতে ভালো মানুষরা আনন্দে থাকতে পারে; তাই না বাবা?

হ্যাঁ, মা। যাতে করে তুমি আমি, আমরা সবাই একসাথে আনন্দে থাকতে পারি।

আচ্ছা বাবা, সেদিন তো ঘৌতায় খারাপ মানুষদের মারতে তুমিও গিয়েছিলে তাই না?

রুস্তমের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, মেয়ে এই কথা কেন জিজ্ঞেস করছে। রুস্তম নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে। খুব স্বাভাবিক গলায় বলে,

কেন মা? কী হয়েছে?

কিছু হয়নি বাবা। ঘৌতার খারাপ মানুষ তাড়াতে বিমান নিয়ে তুমিও গিয়েছিলে না?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

ওদের সবার ওপর তোমরা কেমিকেল ওয়েপন ব্যবহার করেছ, ঠিক বলছি না বাবা?

রুস্তম বিরক্ত হচ্ছে। সে বিরক্ত গলায় বলল,

তোমার এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই ফারিজা।

ফারিজা চিৎকার করে বলল,

আছে বাবা, অবশ্যই আছে।

রুস্তম অবাক হয়ে তার মেয়েকে দেখছে। মেয়ের চোখ টকটকে লাল। এই প্রথম ফারিজার দিকে তাকাতে রুস্তমের ভয় লাগছে। সে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলল, কী হয়েছে তোমার?

ফারিজা তার ট্যাবটা রুস্তমের দিকে এগিয়ে দিলো। রুস্তম দেখল ফারিজার বয়সী একটা ছোট্ট মেয়ের ছবি। যার কোলে ঠিক ফাইয়াজের বয়সী একটি ছেলে। বাচ্চা ছেলেটির মুখে মেয়েটি একটা অক্সিজেন মাস্ক চেপে ধরে আছে। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। উদ্ভ্রান্ত।

রুস্তমের চোয়াল শক্ত হয়। সে বুঝতে পারে কী হয়েছে। ফারিজাকে সে যুদ্ধের স্পর্শকাতর খবরগুলো থেকে সবসময় দূরে রাখতে চেয়েছে। এটা আর সম্ভব হলো না। রুস্তমের এখন খুব ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। সে গম্ভীর গলায় বলল,

তুমি এই ছবি আমাকে দেখাচ্ছ কেন?

বাবা শোনো। এই কিশোরী বোনটা তার দুধের বাচ্চা ভাইটিকে কোলে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ মরে গেছে। তখনো কিন্তু গ্যাস মাস্কটা ভাইয়ের মুখে ধরা ছিল; যাতে ভাইটি অন্তত বেঁচে যায়। কোমল বোনটি মারা যাবে জেনেও অক্সিজেন নলটা নিজে না নিয়ে তার ভাইকে লাগিয়ে রেখেছিল। এমনকি মরার পরও ঠিক একইভাবে ধরে রেখেছিল। বাবা, এই বাবুটা আর মেয়েটা—এরাও কি খারাপ মানুষ? এরাও কি মনস্টার?

রুস্তম কিছু বলল না। ফারিজা বলল,

তোমরা গ্বৌতায় বম্বিং করে খারাপ মানুষদের তাড়াওনি, বরং হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশু-কিশোরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছ বাবা। আমি সব দেখেছি। তোমাদের অন্যায় আমি দেখেছি।

ফারিজা এবার শান্ত হও।

ফারিজা শান্ত হচ্ছে না। সে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। তার চোখ এখন রক্তবর্ণ। সে আবার বলল,

বাবা তোমরা তো হত্যাকারী। খুনি। যুদ্ধের নামে তোমরা হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করছ। খারাপ মানুষ আর মনস্টারদের মারার কথা বলে তোমরা নিষ্পাপ শিশুদেরকে মেরে ফেলছ। তুমিই মেরে ফেলেছ বাবা। আমরা যদি গ্বৌতায় থাকতাম তাহলে তুমি আমাদেরও মেরে ফেলতে বাবা। কী বাবা, আমাদেরকেও মেরে ফেলতে না?

চুপ করো ফারিজা।

না, আমি চুপ করব না।

রুস্তম ফারিজাকে নিজের কাছে নিয়ে আদর করতে দু-হাত বাড়িয়ে দিলো। ফারিজা সাথে সাথে চিৎকার করে বলল,

না বাবা। সাবধান। তুমি আমাকে ছোঁবে না। তোমার হাতে রক্ত বাবা। তোমার হাতে রক্ত।

রুস্তমের অসহায় লাগছে। এই প্রথম তার চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সে অসহায়ের মতো বলল,

মা রে, এমন কেন করছিস?! আমার হাতে কোনো রক্ত নেই রে মা।

আছে বাবা। ওই যে রক্ত। তোমার দু-হাতভরা রক্ত। কী বাজে দুর্গন্ধ আসছে তোমার হাত থেকে। এই হাত দিয়ে তুমি আমাকে ছোঁবে না। যদি তুমি আমাকে ছোঁও, তাহলে আমি এই জানালা দিয়ে নিচে ঝাঁপ দেবো।

এই কথা বলেই ফারিজা জানালা খুলে তার ওপর দাঁড়িয়ে গেল। বারো তলার জানালা খোলার সাথে সাথে বাইরের লূ হওয়া রুস্তমের গা ছুঁয়ে গেল। সাথে সাথে রুস্তমের সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল, কী হচ্ছে এসব। ফারিজাকে না ধরতে পারলে যে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। রুস্তম খুব সুকৌশলে ফারিজার দিকে আগায়, যাতে মোক্ষম সময়ে তাকে ধরে জানালা দিয়ে নিরাপদে নামিয়ে আনা যায়। রুস্তম ফারিজাকে জিজ্ঞেস করল,

ফারিজা এসব তুই কি করছিস?

ফারিজা জানালার ওপর দাঁড়িয়ে বলল,

যা আমার করা উচিত তা-ই করছি বাবা। তোমার হাতে হাজার হাজার শিশুর রক্ত। তোমার গায়ে রক্তের গন্ধ। আমি আর নিতে পারছি না বাবা।

ফারিজা পাগলামি করিস না, মা। জানালা থেকে নেমে আয়। নেমে আয় বলছি।

না বাবা। আমি তোমার সাথে আর থাকব না। তুমি আমার সুপার হিরো না। তুমি একজন খারাপ মানুষ। প্রচণ্ড রকম খারাপ মানুষ। তুমি যাদেরকে মারো তারা মনস্টার না বাবা। তুমিই মনস্টার। তোমরা সবাই মনস্টার। আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

ফারিজা চোখ বন্ধ করল। এখন সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, সে এখান থেকে লাফিয়ে পড়বে। চোখ খোলা অবস্থায় নিচের পিচঢালা রাস্তা চোখে পড়েছিল। সেখানে চলন্ত গাড়িগুলোকে পিঁপড়ের মতো লাগছিল। এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু গরম একটা হাওয়া এসে ফারিজার গা ছুঁয়ে যাচ্ছে। ফারিজার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। এখন শুধু ছোট ভাই ফাইয়াজের কথাই মনে পড়ছে। সে না থাকলে ফাইয়াজকে কে দেখবে। ফাইয়াজ একা হয়ে যাবে। ফারিজা তার দু-হাত প্রসারিত করে। কেন জানি তার মনে হয় দু-হাত ডানার মতো মেলে লাফিয়ে পড়লে সে পাখিদের মতো করে উড়তে পারবে। ফারিজার মন হঠাৎ ভালো হয়ে যায়। সে শুনতে পায় রুস্তম তাকে ডাকছে, ফাইয়াজ কাঁদছে। এখন আর কিছু যায় আসে না। ফারিজা ডানা মেলে উড়তে চায়। সে প্রস্তুত। সে আজকে আকাশ ছুঁয়ে দেখবে।

নেশা

ধোঁয়া ওঠা কফির মগে চুমুক দিলো মুসাব। কফির স্বাদ আগের মতোই আছে। সকালের এই সময়টায় এখানে প্রতিদিন ফেরিওয়ালারা তরকারি ফেরি করে বেড়ায়। আজও তা-ই করছে। গলা ছেড়ে ঠিক আগের মতোই ডাকছে। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো বিছানার ওপর আড়াআড়িভাবে পড়ত। আজও ব্যতিক্রম হয়নি। একইভাবে পড়েছে। সবকিছুই ঠিক আছে। আগের মতোই আছে।

মুসাব কফির মগটা সরিয়ে রাখল। সবকিছু ঠিক আছে মনে হলেও মুসাবের জন্য সবকিছু ঠিক নেই। আগের মতো নেই। পাশের ঘরের বৃদ্ধ মানুষটি, যে ফজর হওয়ার আগেই মুসাবকে ডেকে তুলত তাহাজ্জুদের জন্য। ছোটবেলায় যার আঙুল ধরে বাইরে বেরোলে একটু পরপর মুসাব আনন্দে কেঁপে উঠত। যার হাসি থেকে মুক্ত ঝরে ঝরে পুরো ঘর ভাসিয়ে দিত। সেই মানুষটি আর নেই। আজকে সে নিজ হাতে মানুষটিকে কবরে শুইয়ে এসেছে।

বাবা হিসেবে মানুষটি ছিলেন চমৎকার। মুসাবের ধারণা পুরো পৃথিবীতে যত বাবা আছেন, তার মধ্যে সবথেকে উত্তম বাবাদের একজন ছিলেন তিনি। সব ছেলেই হয়তো তাদের বাবা সম্পর্কে এরকমই ভাবে। কিন্তু মুসাব জানে, সে যা ভাবছে এটা শুধুই ভাবনা নয়; বরং সত্যি। ছেলে হিসেবে বাবার কানাকড়িও পায়নি মুসাব। এই বুড়ো বয়সেও শেষ রাতের প্রায় পুরোটা সময় তিনি আল্লাহর সামনে (নামাজে) দাঁড়িয়ে পার করে দিতেন। সিজদারত অবস্থায় চোখের পানিতে মেঝে ভিজিয়ে ফেলতেন। চোখে ভারি চশমা এঁটে আস্তে আস্তে কুরআন তেলাওয়াত করতেন আর কাঁদতেন। এই যে মুসাব আজকে একজন যোগ্য আলিম হয়েছে। এটা আসলে তার বাবার দুআ, যা হয়তো আল্লাহ কবুল করেছেন।

মুসাবের চোখ জ্বালা করছে। চোখে পানি আসবে আসবে মনে হচ্ছে। বাবার মৃত্যু থেকে কবর দিয়ে আসা পর্যন্ত মুসাব এক ফোঁটাও চোখের পানি ফেলেনি। যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছে। প্রথম যখন সে তার বাবার লাশটা দেখে, তার হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। সে কাঁদেনি। কারণ, মুসলিমদের হাউমাউ করে কাঁদা শোভা

পায় না। আল্লাহ এভাবে হাউমাউ করে মৃতের জন্যে কাঁদা পছন্দ করেন না। এতক্ষণ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। কিন্তু এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। চোখের পানি আটকানো যাচ্ছে না। মুসাব চেয়ার ছেড়ে উঠল। ধীর পায়ে বাবার খালি ঘরটার দিকে এগোল, পুরো ঘরটা আগের মতো আছে। এই তো বিছানার চাদর কিছুটা এলোমেলো, মনে হচ্ছে বাবা এইমাত্র নেমেছেন বিছানা থেকে।

পড়ার টেবিলটায় বইগুলো স্থির হয়ে পড়ে আছে। বাবার ডায়েরিটা খোলা অবস্থায় টেবিলের ওপর শুয়ে আছে। বাবা ডায়েরি লিখতেন। ভারি চশমাটা চোখে লাগিয়ে উবু হয়ে গোটা গোটা অক্ষরে ডায়েরি লিখতেন তিনি। কী লিখতেন কখনো পড়ে দেখা হয়নি। কখনো পড়ার ইচ্ছাও হয়নি। কাল রাতে মৃত্যুর আগেও নিশ্চয় তিনি লিখেছেন। মুসাব ডায়েরিটার কাছে এগিয়ে এলো। শান্ত ভঙ্গিতে ডায়েরিটা হাতে নিলো। হ্যাঁ, বাবা শেষ রাতে লিখেছিলেন। মুসাবের চোখ ভিজে আসছে। সে লেখায় একবার হাত বুলিয়ে পড়তে শুরু করল। বাবার লেখায় কোনো ভূমিকা নেই। তিনি লিখেছেন,

'আমি ১৪০০ বছর আগের সেই সময়টায় ফিরে যেতে চাই। আমার মনে হয় যেকোনো মুসলিমকে জিজ্ঞেস করলে তারাও চাইবে সেই সময়টাতে ফিরে যেতে।

আমি যখন চিন্তা করি খেজুরের পাতার ছাউনি দেওয়া মসজিদ। ফজরের নামাজের জামাতে দাঁড়িয়েছি। আমার একপাশে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরেক পাশে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর সামনে যে ইমামতি করছেন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন চোখের পানি আটকে রাখতে কষ্ট হয়। ইচ্ছা করে ঝাঁপ দিয়ে সেই সময়টাতে চলে যাই।

আহ! কী সৌভাগ্যবান ছিলেন তারা, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যাক আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে তাদের সাথে দেখা হওয়ার বা কথা হওয়ার একটা সুযোগ আল্লাহ আমাদের জন্যও রেখেছেন, আর সেটা হলো যদি আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

আমি অসংখ্য পরিকল্পনা করেছি, যদি আল্লাহ আমার ওপর তাঁর করুণা বর্ষণ করেন এবং আমাকে যদি জান্নাতে নেন (আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করেন, জান্নাতি করেন, আপনার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন আমিন),

তাহলে জান্নাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অনেক কথা বলব। অনেক কথা জমে আছে। এক বৈঠকেই ইনশাআল্লাহ ২০০-২৫০ বছর পার করে দেবো—যদি নবিজি বিরক্ত না হন। তা ছাড়াও অনেক কথা জিজ্ঞেস করার আছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে।

আমার ছেলের নাম রেখেছি মুসাব। মুসাব বিন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু—যাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাব আল খায়ের ডাকতেন—সেই সাহাবির নামে নাম।

মুসাব বিন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা করার সখ আমার। তাঁকেও প্রাণ ভরে দেখব। আল্লাহর জন্য তিনি সব ছেড়েছিলেন এবং শহিদ হয়েছিলেন। তার সাথে আমার পুত্র মুসাবের পরিচয় করায়ে দেবো (ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহ কবুল করেন) ।

তা ছাড়াও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে একসাথে বসে পুরা কাহিনি শুনব ফিতনার সময়ের। এই কাহিনি শোনার জন্যে নিশ্চয় অনেক মুসলিম ভাই উদগ্রীব থাকবেন! মজা হবে যদি সেসময় আমাদের সাথে উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত থাকেন।

আরেকটা সখও আছে আমার। সেটা হলো—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিদের এবং যত বড় বড় আলেম আছেন, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে শুরু করে আরও যারা আছেন, তাদের সবাইকে আমার বাসায় (জান্নাতে যদি আল্লাহ কবুল করেন) দাওয়াত করে খাওয়াব। (আল্লাহু আকবর)

জানি, স্বপ্ন দেখা সহজ কিন্তু বাস্তবায়ন করা কঠিন। যখন নিজের দিকে তাকাই, নিজের গুনাহ, নিজের জীবন দেখে আঁতকে উঠি। প্রচণ্ড ভয় হয়। কিন্তু নিরাশ হতে ইচ্ছা করে না। কারণ, নিশ্চয় আল্লাহর করুণা তাঁর ক্রোধের চেয়ে হাজার কোটিগুণ বেশি। আল্লাহ আমাদেরকে খাওয়ারিজ বা মুরজিয়া হওয়া থেকে রক্ষা করুক এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করুক। তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুক। জান্নাতে প্রতি জুমাবারে তাকে দেখার তাওফিক দান করুক আমিন।'

মুসাবের চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। চোখের পানিতে ডায়েরির পাতাগুলো ভিজে যাচ্ছে। এই কান্না মুসাব আটকাতে পারছে না, আটকানোর চেষ্টাও করছে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কনিষ্ঠ পুত্র সতেরো মাসের ইবরাহিম যখন মারা যায় তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ গড়িয়ে পানি নেমে এসেছিল। এটা দোষের নয়। মুসাব কাঁদছে। বাবার ডায়েরিটা হাতে নিয়ে কাঁদছে। বাবার এই কথাগুলো সে তার স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে চায়। যদি কখনো আল্লাহ তাকে আর তার বাবাকে জান্নাতে যাওয়া তাওফিক দেন। তখন সে এই পুরো লিখাটা মুখস্থ বলে বাবাকে চমকে দিতে চায়। আচ্ছা জান্নাতে কি মানুষের পৃথিবীর এই সময়গুলোর কথা মনে থাকবে?! মুসাব চোখ মোছে। তাকে নেশায় ধরছে। অদ্ভুত এক নেশা। জান্নাতে নামক স্থানটিতে পৌঁছাবার নেশা।

ভোর

জাকারিয়ার হাত বেঁধে ফেলা হয়েছে। ফাঁসির মঞ্চও প্রস্তুত। ঠিক রাত সাড়ে চারটায় তার ফাঁসি কার্যকর হওয়ার কথা। জাকারিয়া বুঝতে পারছে তার হাতে সময় খুব অল্প। জল্লাদকে মনে হয় ঘুম থেকে জোর করে উঠিয়ে আনা হয়েছে। তার মুখে রাজ্যের বিরক্তি।

তার চোখ বলছে, 'ভাই তাড়াতাড়ি করেন, এরে ঝুলায়ে দিয়া একটু ঘুমানো লাগব। পেট খারাপ ছিল তাই ওই রাত্রে একটুও ঘুমাইতে পারি নাই।' জল্লাদকে দেখে জাকারিয়ার খারাপ লাগল, আহারে বেচারা।

জাকারিয়ার ঠিক এই মুহূর্তে ইচ্ছা করছে তার নিজের কাঁচা-পাকা দাড়িতে শেষবারের মতো হাত বোলাতে। হাত পেছন দিকে বাঁধা থাকার কারণেই হয়তো এই ইচ্ছাটা ধীরে ধীরে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। একবার ভাবল জল্লাদকে বলবে, ভাই! একটু হাতটা খুলে দেন, শেষবারের মতো একটু দাড়িতে হাত বোলাতে চাই। এই চিন্তা দ্রুতই সে সরিয়ে ফেলল মাথা থেকে। শেষ ইচ্ছা হিসেবে দাড়িতে হাত বোলানোর ব্যাপারটা ঠিক নিজের কাছেই ভালো লাগল না। অবশ্য জেলার সাহেব তাকে এখানে আসার অনেক আগেই তার শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জেলার মানুষটা ভালো। ছিপছিপে শরীর, বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের ভেতর কিন্তু দেখলে মনে হয় অনেক বেশি বুড়িয়ে গেছে। সেখানে জাকারিয়া এই ষাট বছর বয়সেও একদম যুবার মতো শক্ত এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। জাকারিয়া পেশায় দারোয়ান। তার ফাঁসির রায় হওয়ার প্রধান কারণ হত্যা। তিনি যে অফিসে চাকরি করতেন সেই অফিসের মালিক একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ী। জাকারিয়া তার এই মালিককে হত্যা করে এবং অফিসের ড্রয়ার থেকে টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে।

জল্লাদ জাকারিয়ার ডান হাতের কনুই চেপে ধরে তাকে ফাঁসির মঞ্চে উঠায়। জাকারিয়া বুঝতে পারছে সময় একদমই কম। এখন মনে হচ্ছে সময়টাও খুব বেশি দ্রুত এগোচ্ছে। এইতো সেই দিন, নিজের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায়

করেছেন তিনি। আল্লাহর অশেষ রহমতে খুব ভালো জামাই পেয়েছেন মেয়ের জন্য। মেয়ের জামাই বড় আলেম। মদিনা থেকে পিএইচডি করা। মেয়েকে বিয়ে করে মদিনায় নিয়ে গেছে। সেখানের এক মসজিদে ইমামতি করেন তিনি। জাকারিয়ার জামাই বাবাজি একজন দ্বীনদার মেয়ে খুঁজছিলেন। আল্লাহর কৃপায় জাকারিয়াও তার একমাত্র মেয়েকে দ্বীনদার বানিয়েছে। সে হলফ করে বলতে পারবে, তার মেয়ে সাবালিকা হওয়ার পর কোনো পরপুরুষ তার মেয়ের চেহারা দেখতে পারে নাই। দ্বীনি শিক্ষাটাও তিনি তার এই মেয়েকে দিতে পেরেছিলেন। আর এই জন্যই হয়তো সে দারোয়ান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তার মেয়েকে এত ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়েছেন। সবই আসলে আল্লাহর রহমত।

মেয়ে বিয়ে দিয়ে জামাই বাবাজিসহ মেয়েকে সৌদি পাঠিয়ে দেওয়ার কিছুদিন পরের ঘটনা, জাকারিয়া যে অফিসে কাজ করে সেই অফিসের চেয়ারম্যানের পারসোনাল সেক্রেটারি হিসেবে একটা অল্প বয়স্ক মেয়েকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অফিস ছুটির পর প্রায় প্রতিদিনই চেয়ারম্যান তার সেক্রেটারির সাথে মিটিং করে। অন্যসব কর্মচারী আগেই চলে যায়। জাকারিয়ার মাগরিবের সালাত আদায় করার পর আরও ঘণ্টাখানেক বসতে হয়। তারপর মিটিং শেষ করে তারা বেরিয়ে গেলে জাকারিয়ার কাজ হচ্ছে পুরো অফিস চেক করে তালাবদ্ধ করা।

অন্যসব দিনের মতোই একদিন মেয়েটা চেয়ারম্যানের রুমে যায়। জাকারিয়া অপেক্ষা করে। মাগরিবের আজান হয়। মাগরিবের সালাত আদায় করে জাকারিয়া। তার অপেক্ষা শেষ হয় না। সবদিন তারা এতটা দেরি করে না। আজ কী হলো? একবার মনে করে দরজায় টোকা দেবে। আবার কী মনে করে পিছিয়ে যায়। এশার আজান হয়। জাকারিয়ার অস্বস্তি বাড়তে থাকে। এরকম তো হওয়ার কথা না।

হঠাৎ ভেতর থেকে বিকট এক শব্দ হয়, মনে হয় বড় কোনো কাচের পাত্র আছড়ে ফেলা হয়েছে মেঝেতে। জাকারিয়া দৌড়ে চেয়ারম্যানের কক্ষের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। চেয়ারম্যানের কক্ষে, অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বসার সোফাগুলোর সাথে যে কাচের টেবিলটা আছে, সেটা ভেঙে গেছে। ওই ভাঙা টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে চেয়ারম্যান। মেয়েটির হাতে পিতলের ফুলদানি। ফুলদানির গায়ে তাজা রক্ত। তার চোখে পানি। মেয়েটা জাকারিয়ার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফোঁপাচ্ছে। জাকারিয়া আস্তে করে মেয়েটার হাত থেকে ফুলদানিটি নেয়। চোখের ইশারায় চলে যেতে বলে মেয়েটিকে। মেয়েটা যায় না বরং বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে। জাকারিয়া আবার ইশারা করে চলে যেতে। মেয়েটি এইবার শিশুদের মতো কেঁদে ওঠে। ছোট্ট বাবুরা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে, বাবারা দৌড়ে গিয়ে যখন তাকে টেনে তোলে। তখন যে আস্থা নিয়ে বাচ্চাটা কান্না জুড়ে দেয়। মেয়েটা ঠিক সেইভাবে কাঁদতে শুরু করে। জাকারিয়ার চোখ ভিজে আসে। মেয়েটার জন্য মায়া পড়ে যায় তাঁর। মায়া-মমতা বড় খারাপ জিনিস। যেখানে-সেখানে হুট করে এসে বিপদে ফেলে দেয়।

জল্লাদ কালো কাপড়টা দিয়ে জাকারিয়ার মুখ ঢেকে দেয়। সময় তাহলে সত্যিই শেষ। এখন ফজরের আজান হয় পৌনে পাঁচটায়। আজকের ফজরের আজান আর শোনা হবে না তার। যে ভোরের প্রথম আলো দেখার জন্য সে নামাজ পড়ে এসে ঘরের বাইরে বসে থাকত সেই ভোর হওয়া আর এই জীবনে দেখা হবে না। তারপরও জাকারিয়ার মনটা ভালো। বেশ ভালো। কারণ, তার পরিবর্তে আল্লাহর ইচ্ছায় আজকে একটা মেয়ে ঠিকই ফজরের আজান শুনতে পাবে। ঠিকই সে ভোর হওয়া দেখতে পাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে কারও জীবনে এই ভোর উপহার দেওয়ার আনন্দটাই বা কম কি!

গুনাহ

আমরা হিন্দু মহাসভা সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়ির সামনে জড়ো হয়েছি। কয়েকজন আছি, মনে হচ্ছে আরও মানুষ খবর দিতে হবে। এই কয়জনে হবে না। পরিস্থিতি গরম। সুরেন ব্যানার্জি সাহেব মুজিব ভাইয়ের সহপাঠী আবদুল মালেককে তুলে নিয়ে এসেছে। আমরা শুনেছি বাড়ির ভেতর আবদুল মালেকের ওপর অমানবিক নির্যাতন চলছে। মুজিব ভাই খবর পেয়েই আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে ছুটে এসেছে। আরও ছেলেপেলে খবর দেওয়া হয়েছে। সবাই আসছে। মুজিব ভাইয়ের সাথে সুরেন ব্যানার্জির এমনিতে সম্পর্ক ভালো; কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। এই পরিস্থিতিতে সম্পর্ক ফিকে হয়ে যায়। মুজিব ভাই বাড়ির ফটকের সামনে গেছে কথা বলতে। টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। এটা ১৯৩৮ সাল, হিন্দু-মুসলিম আড়াআড়ি এখন প্রায়ই লেগে থাকে। ছোট আগুনের যে স্ফুলিঙ্গ এখন দেখা যাচ্ছে, যেকোনো মুহূর্তে তা ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হতে পারে। উত্তেজনায় আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। আমরা এখানে যে কয়জন আছি সবাই স্কুলছাত্র, শুধু একজন মাওলানা সাহেব আছেন। আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব। তিনি দিল্লির দেওবন্দ থেকে পড়ে এসেছেন। বড় আলিম। তিনি অবশ্য নিরব দর্শক। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা কী করি সেটা দেখার আগ্রহ চেপে রাখতে না পেরে চলে এসেছেন। এসে আটকে গেছেন। এখন এমন অবস্থায় আমাদের রেখে ফিরেও যেতে পারছেন না। বিপদেই পড়েছেন বলা যায়।

আমরা এখানে যে কয়জন আছি, সবাই বেশ উত্তেজিত; যেকোনো পরিস্থিতি, হাতাহাতি, মারামারির জন্য প্রস্তুত আছি। ব্যতিক্রম শুধু মাইদুল। সে ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কোনো উত্তেজনার ছিটেফোঁটা নেই। সে যে এখনই এমন মনমরা হয়ে আছে ব্যাপারটা তা নয়। গত কয়েকদিন ধরেই তার এই অবস্থা। জিজ্ঞেস করলে কিছুই বলে না। ফুটবল খেলতেও আসে না। চুপ করে ঘরের এক কোণায় বসে থাকে। গত রাতে যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন শুধু বলেছিল, আমাকে সে কিছু একটা বলতে চায়। সাথে বন্ধুরা থাকায় সেসময় আর ওর কথা শোনা হয়নি। আজ যখন মুজিব ভাই আমাদের কয়েকজনকে এখানে আসার জন্য ডাকছে

শুনলাম, তখন ভাবলাম মাইদুলকেও নিয়ে যাই। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে হয়তো মনমানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন হবে। কিসের কী! 'যাহাই বাঁধাকপি তাহাই পাতাকপি।' এখন তো মনে হচ্ছে ওকে এখানে এনে বিপদেই পড়েছি। মারামারির সময় সবার মানসিকতা একরকম থাকা জরুরি। কারও সাহসে কিংবা উৎসাহে ঘাটতি থাকলে পুরো দলেরই হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা হতে দেওয়া যায় না। আমি গলা উঁচিয়ে ডাকলাম,

মাইদুল! এই মাইদুল!

মাইদুল শান্ত চোখে আমার দিকে তাকাল। কী বিষণ্ন চোখ। আমি বললাম,

কী হইসে তোর বল তো? তোকে এমন উদ্ভ্রান্ত দেখায় ক্যান?

কিছু হয় নাই।

কিছু না হইলে মুখটা এইরকম অন্ধকার কইরা রাখছস ক্যান। আমাগোর মালেক ভাইরে ওরা আটকায়া রাখছে। কত বড় সাহস ওগোর। মুসলিম কী জিনিস তারা টের পায় নাই। আজকে টের পাইব।

হুঁ।

হুঁ কী? হুঁ কী? তোর কি মালেক ভাইয়ের জন্য খারাপ লাগে না? আজকে মুসলিম একজনরে উঠায়ে নেওয়ার সাহস করছে। এখন যদি আমরা মালেক ভাইরে বাইর কইরা না নিয়া যাই তাইলে ওগো সাহস আরও বাড়ব। কালকে আমারে উঠাইব পরশু তোরে। বুঝতাছস।

হুঁ ...

খালি হু হু করতাছস ক্যান? তোর কী হইসে খুইলা ক।

আমার কিছু হয় নাই। আমি বাড়ি যামু।

বাড়ি যাবি মানে?

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। নিজেকে আটকাতে পারলাম না। শরীরের সব শক্তি দিয়ে মাইদুলের শার্টের কলার চেপে ধরলাম। ওকে টেনে কাছে এনে বললাম,

কাপুরুষ, তোরে মাটিতে গাইরা ফালামু।

অন্য যেকোনো সময় হলে আমাকে আর মাইদুলকে ছাড়িয়ে দিতে সবাই এগিয়ে আসত। এখন কেউ আগাচ্ছে না। কারণ, সুরেন ব্যানার্জি বাবুর বাড়ির ভেতরের পরিবেশ খুব

একটা ভালো মনে হচ্ছে না। সবাই মুজিব ভাইয়ের নির্দেশের অপেক্ষা করছে। মুজিব ভাই একটা ডাক দিলেই সবাই এগিয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের এই অহেতুক চেঁচামেচির দিকে তাকানোর সময় কারও নেই। আমাদের দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ না করলেও মাওলানা সাহেব ঠিকই দেখলেন। তিনি দ্রুত আমাদের কাছে এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে মাইদুলকে ছাড়িয়ে নিলেন। মাইদুলের কাঁধে হাত রাখলেন তারপর কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,

কী হয়েছে বাবা তোমার? আমাকে বলো। তোমার মতো এত ভালো একটা ছেলে এরকম কেন করছ? তুমি তো নামাজ-রোজায়ও কখনো গাফলতি করো না। কী হয়েছে তোমার?

মাইদুলের চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। সে হুট করে একটা কাণ্ড করে বসল। কেউ কিছু বোঝার আগেই ইমাম সাহেবকে জড়ায়ে ধরল। মাইদুল কাঁদছে। ইমাম সাহেবের কাঁধ মাইদুলের চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে। ইমাম সাহেব কিছু বলছেন না। তিনিও মাইদুলকে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই এখন আমাদের তিনজনের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাচ্ছে। এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মায়াকান্না কারওই ভালো লাগার কথা না। সবাই বিরক্ত। এরকম একটা মুহূর্তে এসব ন্যাকামি কেউ মেনে নেবে না।

আমি ইমাম সাহেব এবং মাইদুলকে নিয়ে একটু পাশে সরে এলাম। এতক্ষণে খবর পেয়ে আমাদের আরও কিছু লোক এসে পড়েছে। কয়েকজনের হাতে লাঠিসোটা আছে। সবাই মোটামুটি সুরেন ব্যানার্জির বাড়ি ঘেরাও করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সুতরাং আমাদের তিনজনের দিকে এখন কারও তেমন নজর নেই। মাওলানা সাহেব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমাকে বল কী হয়েছে?

মাইদুল চোখ মুছল, খানিক সময় নিলো, তারপর ধীর গলায় বলল,

হুজুর, আমি অন্যায় করছি, বড় গুনাহ করছি, আমার এখন কী হইব?

কী করেছ তুমি?

আমি জিনা করছি, ব্যভিচার করছি। এমন মানুষের সাথে আমি এই নিকৃষ্ট কাজ করছি যে আমি তা বলতে পারমু না। কয়েকদিন ধইরা নামাজও আদায় করতে পারতেছি না। আল্লাহর সামনে কোন মুখ নিয়া দাঁড়ামু?! হুজুর আমারে শাস্তি দেন। নবিজির কাছে আইসা এক সাহাবি যেমন নিজের বিচার চাইছিল, বিচারে যেমন তাকে পাথর ছুইরা হত্যা করা হইছিল। আমারও এমন বিচার করেন। আমারেও পাথর মাইরা হত্যা কইরা ফালান হুজুর।

মাইদুল ফুঁপিয়ে কাঁদছে, তার শ্বাস আটকে আসছে। সে ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে।